আবহাওয়া এবং জলবায়ু
(Weather and Climate)

ইউনিট ৮

ভূমিকা

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। বায়ুমন্ডল ও তার গঠনকারী উপাদানভেদেও বায়ুমন্ডলের বৈশিষ্ট্য ও ভূ-প্রাকৃতিক অঞ্চল বৈচিত্র্যময় হয়। বায়ুমন্ডলের নিম্নস্তরে চাপ, তাপ, আর্দ্রতা ও বায়ুপ্রবাহের পার্থক্য তৈরি হলেই প্রতিদিনের বায়ুপ্রবাহ, বায়ুতাপ ও চাপের পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। আবহাওয়া হলো কোনো স্থানের দৈনন্দিন বায়ুর তাপ, চাপ, বায়ুপ্রবাহের বৈশিষ্ট্য, বায়ুর আর্দ্রতা, বারিপাত ইত্যাদি উপাদানের গড় অবস্থা অর্থাৎ কোনো নির্দিষ্ট স্থানের স্বল্পকালীন সময়ের বায়ুমন্ডলের উপাদানসমূহের গড় অবস্থাকে বলা হয় আবহাওয়া। জলবায়ু হলো কোনো একটি অঞ্চলের অনেক বছরের আবহাওয়ার সামগ্রিক গড় অবস্থা। সাধারণত ৩০ থেকে ৪০ বছরের আবহাওয়ার গড়কে জলবায়ু বলে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ ৮.১ : আবহাওয়া এবং জলবায়ুর উপাদান ও নিয়ামক
পাঠ ৮.২ : তাপবলয়
পাঠ ৮.৩ : চাপবলয়
পাঠ ৮.৪ : বায়ুপ্রবাহ
পাঠ ৮.৫ : বায়ুর আর্দ্রতা
পাঠ ৮.৬ : কুয়াশা ও মেঘ
পাঠ ৮.৭ : বৃষ্টিপাত
পাঠ ৮.৮ : কালবৈশাখী
পাঠ ৮.৯ : ঘূর্ণিঝড়
পাঠ ৮.১০ : টর্নেডো

পাঠ-৮.১ আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপাদান ও নিয়ামক
(Elements and Factors of Weather and Climate)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- আবহাওয়া ও জলবায়ু বলতে কী বুঝায় তা বলতে পারবেন এবং
- আবহাওয়া এবং জলবায়ুর উপাদান ও নিয়ামকগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

আবহাওয়া

কোনো নির্দিষ্ট স্থানের নিদিষ্ট সময়ের বায়ুর তাপ, চাপ, আর্দ্রতা, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ, তুষারপাত, মেঘাচ্ছন্নতা ইত্যাদি উপাদানের গড় অবস্থাকে আবহাওয়া বলে। আবহাওয়া সবসময়ই পরিবর্তনশীল।

জলবায়ু (Climate) : কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলের কয়েক বছরের গড় আবহাওয়াকে জলবায়ু বলে। পরিবর্তনশীল আবহাওয়ায় কোনো স্থানের বায়ুর তাপ, চাপ, বায়ুপ্রবাহ, আর্দ্রতা, মেঘাচ্ছন্নতা, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ইত্যাদির ৩০-৪০ বছরের গড় অবস্থাকে সে স্থানের জলবায়ু বলা হয়। অক্ষাংশ, সমুদ্র হতে দূরত্ব, বায়ুপ্রবাহের দিক, ভূ-পৃষ্ঠের উচ্চতা, সমুদ্রস্রোত ইত্যাদি নিয়ামকের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন অঞ্চলে জলবায়ুর পার্থক্য দেখা যায়।

আবহাওয়া ও জলবায়ুর নিয়ামক : আবহাওয়া ও জলবায়ুর নিয়ামকসমূহ সর্বত্র সমানভাবে কাজ করে না। নিম্নে আবহাওয়া ও জলবায়ুর নিয়ামকসমূহ আলোচনা করা হলো-

১। অক্ষাংশ	২। উচ্চতা	৩। সমুদ্র থেকে দূরত্ব	৪। স্থলভাগ ও জলভাগের অবস্থান
৫। সমুদ্রস্রোত	৬। ভূমির ঢাল	৭। ভূ-প্রকৃতি	৮। বায়ুপ্রবাহ
৯। বায়ুর চাপ এবং	১০। বনভূমির অবস্থান।		

১. অক্ষাংশ : পৃথিবীর একেক অক্ষাংশে একেকভাবে সূর্যরশ্মি পতিত হয়। তাই এটি জলবায়ুর একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। নিরক্ষীয় অঞ্চলে সূর্য লম্বভাবে কিরণ দেয় বলে এই অঞ্চলে বায়ুর তাপ বেশি হয়। আবার উচ্চ অক্ষাংশে সূর্য তির্যকভাবে কিরণ দেয় ফলে বায়ুর তাপ কম হয়। নিরক্ষরেখা থেকে উত্তর মেরুর দিকে বায়ুমন্ডলের তাপমাত্রা হ্রাস পেতে থাকে এবং দক্ষিণ মেরুর দিকেও একই অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। তাপ বেশি হলে বায়ু উত্তপ্ত হওয়ায় হালকা হয়ে নিম্নচাপের সৃষ্টি করে এবং তাপ কম হলে বায়ু ঘণীভূত হয়ে উচ্চ চাপের সৃষ্টি করে। ৮.১.১ নং চিত্রে অক্ষাংশ ভেদে সূর্যরশ্মি পতনের বৈশিষ্ট্য দেখানো হলো। চিত্রে দেখা যাচ্ছে যে, মেরু এলাকায় সূর্যরশ্মি কৌণিকভাবে পতিত হওয়ায় আলোকরশ্মি বিস্তৃত এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। ফলে কম বায়ুস্তর ভেদ করে সূর্যরশ্মি পতিত হয়। তুলনামূলকভাবে নিরক্ষীয় অঞ্চলে সূর্যালোক খাড়াভাবে পতিত হওয়ায় কম স্থান জুড়ে কিরণ দেয় এবং দূরত্বও কম হয়।

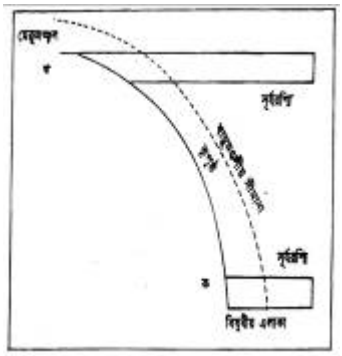

চিত্র-৮.১.১:অক্ষাংশভেদে সূর্যরশ্মি পতন

২. উচ্চতা : উচ্চতা যত বৃদ্ধি পায় বায়ুমন্ডলীয় তাপমাত্রা তত বেশি হ্রাস পায়। সাধারণত প্রতি ১০০০ মিটার উচ্চতায় ৬° সেলসিয়াস তাপমাত্রা হ্রাস পায়। উচ্চতার জন্যই একই অক্ষাংশে অবস্থিত দুই জায়গার জলবায়ুতে পার্থক্য দেখা যায়। যেমন- দিনাজপুর ও শিলং একই অক্ষাংশে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও শুধু উচ্চতা ভিন্নতার জন্য এদের জলবায়ু ভিন্নরকম হয়। দিনাজপুরের চেয়ে শিলং এর তাপমাত্রা অনেক কম। ৮.১.২ নং চিত্রে উষ্ণতার সাথে উচ্চতা বৃদ্ধির প্রভাব দেখানো হলো।

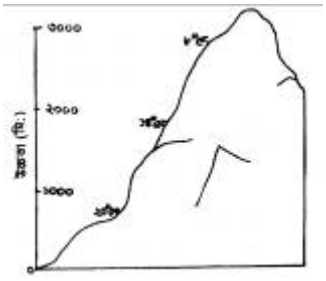

চিত্র-৮.১.২: উচ্চতা

৩. সমুদ্র থেকে দূরত্ব : সমুদ্র হতে দূরত্ব জলবায়ুতে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। জলভাগের অবস্থান কোনো এলাকার জলবায়ুকে মৃদুভাবাপন্ন করে। যেমন- কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, পটুয়াখালী সমুদ্র উপকূলে অবস্থিত হওয়ায় এসব স্থানের জলবায়ু মৃদুভাবাপন্ন।

সমুদ্রের নিকটবর্তী এলাকায় শীত-গ্রীষ্ম তেমন পার্থক্য না হলেও সমুদ্র উপকূল থেকে দূরের এলাকায় শীত ও গ্রীষ্ম উভয়ই বেশি হয়। এ কারণে সমুদ্র নিকটবর্তী জলবায়ুকে সমভাবাপন্ন ও দূরবর্তী জলবায়ুকে মহাদেশীয় চরমভাবাপন্ন জলবায়ু বলা হয়। চিত্র ৮.১.৩ এ সমুদ্র ও ভূমির উষ্ণতার পার্থক্যের প্রভাব দেখানো হয়েছে।

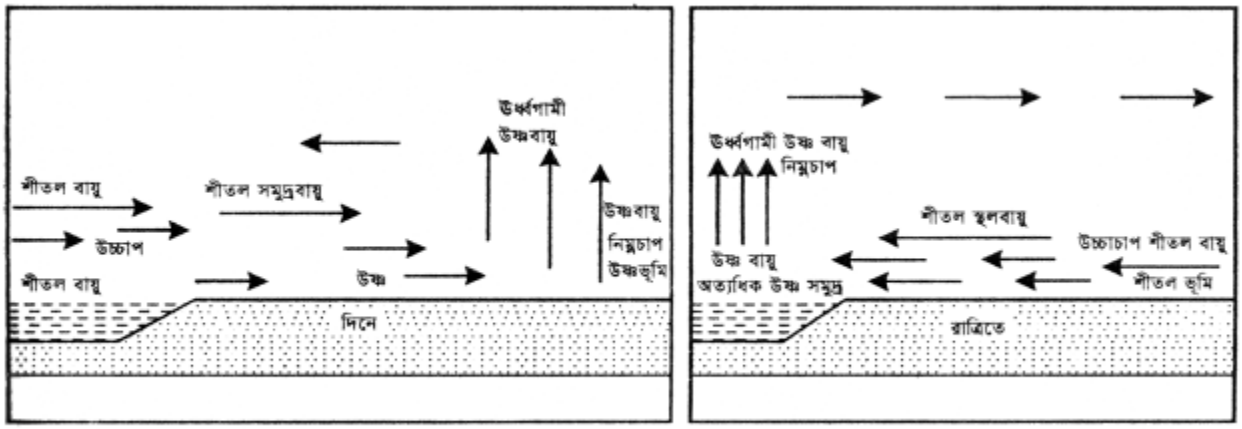

চিত্র ৮.১.৩ : আবহাওয়া ও জলবায়ুতে সমুদ্রের অবস্থানের প্রভাব

স্থলভাগের চেয়ে জলভাগ অনেক ধীরে ধীরে উত্তপ্ত হয়। কারণ পানির আপেক্ষিক তাপ ধারণ ক্ষমতা বেশি। অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সমুদ্রের পানি উত্তপ্ত হতে যে পরিমাণ তাপের দরকার হয় তার সমপরিমাণ মাটি উত্তপ্ত হতে তার থেকে কম তাপ দরকার হয়। তবে সৌরতাপ ভূমি অপেক্ষা সমুদ্রের অনেক গভীরে প্রবেশ করে তাপ বিস্তার করে। এ কারণেই অনেক দীর্ঘ সময়ে সমুদ্র উত্তপ্ত হয়। আবার তাপ বিকিরণের ক্ষেত্রে সমুদ্র পুনরায় ধীরে ধীরে তাপ হারায় যা ভূমির ক্ষেত্রে আরও দ্রুত হয়। ফলে সমুদ্র ঠান্ডা হতেও দীর্ঘ সময় লাগে। মূলত এ কারণেই গ্রীষ্মকালে উপকূলীয় এলাকা ভূ-ভাগের অভ্যন্তরের তুলনায় শীতল হয় এবং শীতকালে তুলনামূলকভাবে উষ্ণ থাকে।

৪. স্থলভাগ ও জলভাগের অবস্থান : স্থল ও জলভাগের অবস্থানের উপর ভিত্তি করে আবহাওয়া ও জলবায়ুর ধরনের মধ্যে তারতম্য দেখা যায়। ভূ-পৃষ্ঠের প্রায় ৭১% জলভাগ ও অবশিষ্ট ২৯% স্থলভাগে আবহাওয়া ও জলবায়ুর পার্থক্য দেখা যায়। মূলত জল ও স্থলভাগের অসম বন্টনের জন্যই এদের ভৌত গুণাবলির বিভিন্নতা দেখা যায় যা আবহাওয়া ও জলবায়ুকে প্রভাবিত করে। সমুদ্র হলো জলভাগের সবচেয়ে বড় উৎস। সমুদ্রের পানির স্রোতের স্থানান্তর ঘটে জোয়ার ভাঁটার দ্বারা এবং এর মাধ্যমেই সমুদ্রপৃষ্ঠের বায়ু উত্তপ্ত ও পুনঃবন্টন হয়। আবার স্থলভাগ জলভাগের তুলনায় তাড়াতাড়ি উত্তপ্ত ও ঠান্ডা হয়। কারণ স্থলভাগের আপেক্ষিক তাপ জলভাগের থেকে কম।

স্থলভাগ জলভাগ থেকে তুলনামূলকভাবে বেশি তাড়াতাড়ি উত্তপ্ত হয়। কারণ জলভাগের ওপর আপতিত সূর্যরশ্মির ৭০-৯০% বাষ্পীভবনে ব্যবহৃত হয় এবং এক্ষেত্রে স্থলভাগের ওপর আপতিত সূর্যরশ্মির মাত্র ৫.৫% বাষ্পীভবনে কাজে লাগে। বাকী অংশটুকু ভূমি ও এর উপরের বায়ুমন্ডল উত্তপ্ত করার কাজে ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও স্থলভাগে জলভাগের তুলনায় উচ্চহারে সূর্যরশ্মি প্রতিফলনও একটি বড় কারণ। জলভাগ ও স্থলভাগের এ সকল ভৌত গুণাবলীর তারতম্যের কারণে জলভাগের আবহাওয়া স্থলভাগ অপেক্ষা মৃদুভাবাপন্ন। শীতকালে জলভাগের চেয়ে স্থলভাগ বেশি শীতল থাকে এবং গ্রীষ্মকালে স্থলভাগ বেশি গরম থাকে।

৫. সমুদ্রস্রোত : শীতল বা উষ্ণ সমুদ্রস্রোতের প্রভাবে উপকূল সংলগ্ন এলাকার বায়ু ঠান্ডা বা উষ্ণ হয়। যেমন- উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোতের প্রভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূলবর্তী এলাকার উষ্ণতা বেড়ে যায়। অর্থাৎ সমুদ্রস্রোত বায়ুর তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় উত্তর আমেরিকার উত্তর-পূর্ব উপকূলকে শীতল রাখে শীতল ল্যাব্রাডার স্রোত, এ কারণে শীতল ইউরোপীয় স্রোত ও উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোতের প্রভাবে একই অক্ষাংশে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও উত্তর আমেরিকার পূর্ব উপকূল ও পশ্চিম ইউরোপীয় উপকূলের তাপমাত্রার ব্যাপক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

৬. ভূমির ঢাল : ভূমির ঢালের কারণে সূর্যকিরণ পতিত হবার ধরণে পার্থক্য হয়। তাই ভূমির ঢালের অবস্থান জলবায়ু পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। যেসব এলাকায় ভূমির ঢালের জন্য সূর্যকিরণ উচুভূমির ঢাল বরাবর লম্বভাবে পতিত হয় সেখানের বায়ু বেশি উত্তপ্ত হয়।

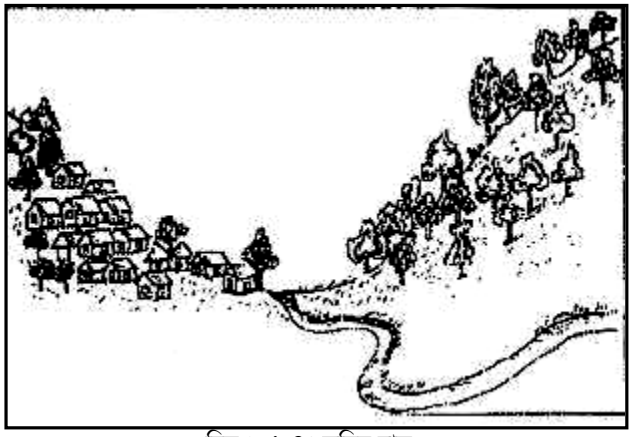

চিত্র-৮.১.৪ঃ ভূমির ঢাল

যেমন- উত্তর গোলার্ধে কর্কটক্রান্তির উত্তরে দক্ষিণমুখী ঢাল সব সময় দ্বি-প্রহরের সূর্যের আলো পায়, অন্যদিকে দক্ষিণ গোলার্ধে মকরক্রান্তির দক্ষিণে উত্তরমুখী ঢাল সবর্দাই দ্বি-প্রহরের সূর্যালোক পায়। তবে নিরক্ষরেখা এবং কর্কটক্রান্তির মাঝে দক্ষিণমুখী ঢাল বিশিষ্ট যেসব এলাকা রয়েছে সেখানে উত্তরমুখী এলাকার থেকে দীর্ঘ সময় ধরে সূর্যের আলো পায় (চিত্র-৮.১.৪)।

৭. ভূ-প্রকৃতি : পবর্তের অবস্থান, ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থা ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে জলবায়ুর প্রকৃতিতে পার্থক্য দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, উত্তরে পার্বত্য অঞ্চলে বায়ুপ্রবাহ বাধাপ্রাপ্ত হয়ে জলবায়ুতে প্রভাব বিস্তার করে। যেমন- গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু যখন হিমালয়ে বাধাপ্রাপ্ত হয় তখন নেপাল, বাংলাদেশ, ভারতে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অধিক হয়। তবে এই বায়ুপ্রবাহ হিমালয় অতিক্রম করতে না পারায় উত্তর পাহাড়ের ঢালে এ সময় বৃষ্টিপাত হয় না। একইভাবে শীতকালে শীতল সাইবেরীয় বায়ু উচ্চ হিমালয় পবর্তে বাধাপ্রাপ্ত হয়। ফলে উত্তর ঢালে এ সময় বৃষ্টিপাত হয় না। এ সময়ে দক্ষিণে শীতের তীব্রতা ইউরোপের থেকে কম হয়।

চিত্র-৮.১.৫: ভূ-প্রকৃতি

হিমালয় পবর্তের অবস্থানের জন্য শীতল সাইবেরীয় বায়ুর প্রভাবে হিমালয়ের উত্তরাংশের চীন ভূ-খন্ডে উষ্ণতা -১০° সেলসিয়াস থেকে -৫° সেলসিয়াস এবং দক্ষিণে ভারতীয় উপমহাদেশে ২০° সেলসিয়াস থেকে ২৫° সেলসিয়াস পর্যন্ত তাপমাত্রা সৃষ্টি হয় (চিত্র-৮.১.৫)। অতএব বলা যায় যে, ভূ-প্রকৃতির উপর আবহাওয়া ও জলবায়ু নির্ভরশীল।

৮. বায়ুপ্রবাহ : বায়ুপ্রবাহের জন্য কোনো এলাকার জলবায়ুতে বিশেষ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন- কোনো এলাকায় যদি জলীয়বাষ্পপূর্ণ বায়ু প্রবাহিত হয় তবে ঐ এলাকায় প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। যেমন- বাংলাদেশে বর্ষাকালে মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হয়। এই বায়ু জলীয়বাষ্পপূর্ণ হওয়ায় এ সময় প্রচুর বৃষ্টি হয় কিন্তু শীতকালে শুষ্ক মহাদেশীয় বায়ুর প্রভাবে বৃষ্টিপাত প্রায় হয় না বললেই চলে।

৯. বায়ুর চাপ : বায়ুর চাপ আবহাওয়া ও জলবায়ুর অন্যতম নিয়ন্ত্রক। নিম্নচাপ বলয়ের উত্তপ্ত বায়ুপ্রবাহ উচ্চচাপ বলয়ের দিকে প্রবাহিত হওয়ায় উচ্চচাপ বিশিষ্ট শীতল অঞ্চলের তাপমাত্রা বেড়ে যায়। অন্যদিকে শীতল অঞ্চলের বায়ুপ্রবাহের কারণে নিম্নচাপ বিশিষ্ট উষ্ণ অঞ্চলের তাপমাত্রা হ্রাস পায়।

১০. বনভূমির অবস্থান : বনভূমির অবস্থান বায়ুর উষ্ণতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রকোপ ইত্যাদির হারকে কমিয়ে দিতে সাহায্য করে। বনভূমির অবস্থান বৃষ্টিপাত ঘটানোসহ আবহাওয়া ও জলবায়ুতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। গাছপালা প্রস্বেদনের সাহায্যে জলীয়বাষ্প গ্রহণ করে এবং পরিবেশে ভারসাম্য বজায় রাখে। ফলে যে কোনো স্থানের আবহাওয়া ঠান্ডা থাকে।

শিক্ষার্থীর কাজ	আবহাওয়া ও জলবায়ুর নিয়ামকগুলো কীভাবে প্রভাব বিস্তার করে ব্যাখ্যা করুন।

সারসংক্ষেপ

আবহাওয়া ও জলবায়ুর মূল নিয়ামকগুলো প্রধানত আবহাওয়া ও জলবায়ুর ধরনের মধ্যে পার্থক্য তৈরি করে। আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপাদানসমূহ যথা-বায়ুর চাপ, বায়ুপ্রবাহ, সমুদ্রস্রোত, সমুদ্র থেকে দূরত্ব, বনভূমির অবস্থান, ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থা, উচ্চতা, অক্ষাংশ, স্থলভাগ ও জলভাগের অবস্থান, ভূমির ঢাল ইত্যাদির প্রভাবে বিশ্বের একেক অঞ্চলে একেক ধরনের আবহাওয়া ও জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। আবহাওয়া ও জলবায়ুর নিয়ন্ত্রক-

i. বায়ুপ্রবাহ ii. বায়ুর বাষ্পীয় প্রস্বেদন iii. ভূমির ঢাল

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i , ii ও iii

২। বাংলাদেশ, নেপাল ও ভারতে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়, কারণ-

(ক) সমুদ্র পৃষ্ঠ উত্তপ্ত হওয়ায় (খ) বায়ুপ্রবাহ হিমালয়ে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে

(গ) বায়ুর চাপ নিম্নাঞ্চলে বেশি হওয়ায় (ঘ) ভূমির ঢাল নেই বলে

৩। কক্সবাজারের জলবায়ুকে কেমন জলবায়ু বলা হয়?

(ক) চরমভাবাপন্ন (খ) মৃদুভাবাপন্ন

(গ) সমভাবাপন্ন (ঘ) নিয়তভাবাপন্ন

পাঠ-৮.২ তাপবলয় (Temperature Belt)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি -

- বায়ুর তাপ ও তাপবলয় কী তা বলতে পারবেন এবং
- বায়ুর তাপের উৎস ও তারতম্যের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

তাপবলয়

সূর্যালোক বা সৌরশক্তি থেকে আগত যে তাপ বায়ুমন্ডলকে উত্তপ্ত করে, তাকেই বায়ুর তাপ বলা হয়। বর্তুলাকার পৃথিবীর উষ্ণতার তাপ অঞ্চলসমূহ সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠে বলয়ের ন্যায় অবস্থান করে। এরূপ বলয়কে তাপবলয় বা তাপমন্ডল বলে। সমতাপবিশিষ্ট অঞ্চলগুলোকে একই রেখা দিয়ে দেখানো যায়। এরূপ রেখার ক্ষেত্রে সমুদ্র সমতল থেকে ঊর্ধ্বদিকে সমতাপ বিশিষ্ট স্থানকে একটি কাল্পনিক রেখা দ্বারা অংকন করা হয়, যাকে সমোষ্ণরেখা বলে। এই রেখা দ্বারা কোনো স্থানের তাপের বিন্যাস ও বৈশিষ্ট্য দেখানো হয়।

বায়ুর তাপের উৎস : সূর্যরশ্মি সকল তাপের উৎস। সূর্য থেকে আগত সৌরশক্তি বায়ুমন্ডলকে উত্তপ্ত করে এবং বায়ুমন্ডলের জলীয়বাষ্প, কৃত্রিম উপাদান ও ধূলিকণার সাথে মিশে যায়। এই সকল উপাদান সৌরশক্তিকে আংশিকভাবে শোষণ করে এবং বায়ুমন্ডলকে উত্তপ্ত করে। পৃথিবীর স্থলভাগ ও জলভাগ যে তাপ গ্রহণ করে তা রাতের বেলায় তাপ বিকিরণ পদ্ধতিতে বায়ুমন্ডলে তাপ বৃদ্ধি করে। এ জন্যই পৃথিবীর সর্বত্র তাপ একই রকম হয় না।

তাপের তারতম্য : বায়ু তাপের প্রধান উৎস সূর্য। দিনের দৈর্ঘ্য বেশি হলে বায়ুমন্ডল সূর্যরশ্মি থেকে বেশি তাপ গ্রহণ করে এবং উত্তপ্ত হয়। নিরক্ষীয় অঞ্চলে সূর্যরশ্মি লম্বভাবে পতিত হওয়ায় সেখানে তাপমাত্রা বেশি হয়। এসব স্থানে সূর্যালোক কম স্থান জুড়ে বিস্তৃত হয় এবং অপেক্ষাকৃত কম বায়ুস্তর ভেদ করে। আবার বিপরীত রূপটি দেখা যায় যেসব স্থানে সূর্যালোক তিযর্কভাবে পড়ে সেখানে। এছাড়া যে বায়ুতে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ বেশি তাতে বায়ুর তাপমাত্রাও বেশি। সমুদ্রতল থেকে উপরের দিকে বায়ুর তাপ ক্রমান্বয়ে কমতে থাকে। প্রতি ৩০০ ফুট উপরে উঠলে ১° ফারেনহাইট কমে যায় অর্থাৎ ১০০০ ফুট উঠলে ৩.৩° ফারেনহাইট কমে যায়। কখনও কখনও উপরে উঠলে তাপ বৃদ্ধি পায়। একে তাপ উৎক্রম (Inversion of Temperature) বলে। অর্থাৎ স্বাভাবিক তাপ হ্রাসের হারের ঠিক বিপরীত হচ্ছে তাপমাত্রার ব্যতিক্রম বা উৎক্রম। তাপের এ উৎক্রম কখনও বায়ুপ্রাচীরজনিত কারণে সংঘঠিত হয়।

তাপমন্ডল : বায়ুমন্ডলের তাপবলয়কে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায় (চিত্র ৮.২.১)। যথা-

১। উষ্ণমন্ডল
২। উত্তর নাতিশীতোষ্ণ মন্ডল
৩। দক্ষিণ নাতিশীতোষ্ণ মন্ডল
৪। উত্তর হিমমন্ডল এবং
৫। দক্ষিণ হিমমন্ডল।

১. উষ্ণমন্ডল : নিরক্ষরেখা থেকে উভয় দিকে ক্রান্তীয় অঞ্চল পর্যন্ত তাপমাত্রা বেশি থাকায় একে উষ্ণমন্ডল বা গ্রীষ্মমন্ডল বলে। কারণ সূর্য বছরে মোট দু'বার নিরক্ষরেখার উপর লম্বভাবে কিরণ দেয়। কর্কটক্রান্তি ও মকরক্রান্তিতে সূর্য লম্বভাবে কিরণ দেয় বলে এই অঞ্চলে তাপ বেশি থাকে। এ অঞ্চলে বছরের অধিকাংশ সময় সূর্যরশ্মি খাড়াভাবে পতিত হয় এবং কোনো সময়ই দিন-রাত্রির দৈর্ঘ্যের ব্যবধান খুব বেশি হয় না।

২. উত্তর নাতিশীতোষ্ণ মন্ডল : কর্কটক্রান্তি হতে সুমেরুবৃত্ত ও মকরক্রান্তি থেকে কুমেরু বৃত্ত পর্যন্ত ২৩$^{১/২°}$ উত্তর অক্ষাংশ হতে ৬৬$^{১/২°}$ উত্তর পর্যন্ত সূর্যরশ্মি কখনো সরাসরি কখনোবা তির্যকভাবে পতিত হয়। এই দুই অঞ্চলে তখন শীত ও গ্রীষ্মের তাপের পার্থক্য হয় না। উত্তর গোলার্ধে এই মন্ডলকে বলা হয় উত্তর নাতিশীতোষ্ণ মন্ডল।

৩. দক্ষিণ নাতিশীতোষ্ণমন্ডল : দক্ষিণে **২৩**$^{১}/_{২}^{\circ}$ হতে **৬৬**$^{১}/_{২}^{\circ}$ দক্ষিণ অক্ষাংশ পর্যন্ত এলাকাটি দক্ষিণ নাতিশীতোষ্ণমন্ডল বলে পরিচিত। এখানে সারা বছরই মধ্যম উষ্ণতা থাকে। এখানকার গড় তাপমাত্রা ০-২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকে।

৪. উত্তর হিমমন্ডল : সুমেরুবৃত্ত থেকে সুমেরু পর্যন্ত এবং কুমেরুবৃত্ত থেকে কৃমেরু পর্যন্ত ৬৬$^{১}/_{২}^{\circ}$ উত্তর অক্ষাংশ হতে ৯০$^{\circ}$ উত্তর অক্ষাংশ পর্যন্ত সূর্যলোক তির্যকভাবে পতিত হয়। এই এলাকায় বছরে প্রায় ছয় মাস সূর্যালোক পৌছাঁয় না বলেই প্রচন্ড শীত অনুভূত হয় এবং সারা বছরই বরফে আবৃত থাকে। উত্তর গোলার্ধের এই অংশকে বলা হয় উত্তর হিমমন্ডল।

৫. দক্ষিণ হিমমন্ডল : উত্তর গোলার্ধে যখন প্রচন্ড শীতকাল বিরাজ করে তখন দক্ষিণ গোলার্ধে অনুরূপ অবস্থা বিরাজ করে যাকে দক্ষিণ হিমমন্ডল বলে। এখানেও সারা বছর বরফে আবৃত থাকে। দক্ষিণ হিমমন্ডলের অবস্থান ৬৬$^{১}/_{২}^{\circ}$ দক্ষিণ অক্ষাংশ থেকে ৯০$^{\circ}$ দক্ষিণ অক্ষাংশ পর্যন্ত।

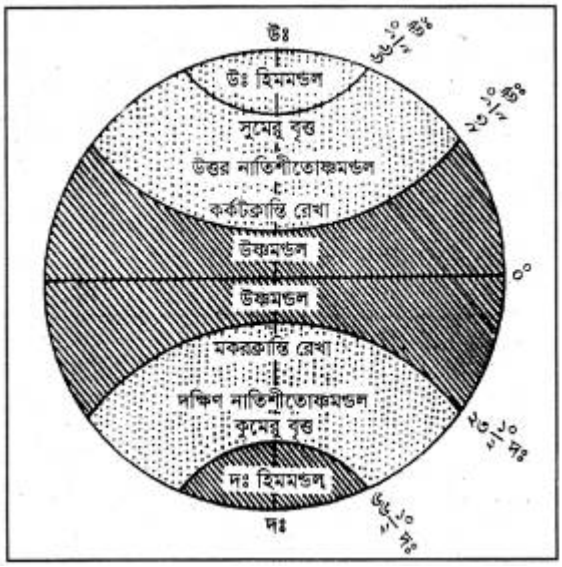

৮.২.১ চিত্র : পৃথিবীর তাপবলয়

শিক্ষার্থীর কাজ	বায়ুর তাপের উৎস ও তাপের তারতম্যের কারণ ব্যাখ্যা করুন।

সারসংক্ষেপ

সূর্য থেকে আসা সৌররশ্মিই তাপের প্রধান উৎস। তাপবলয় বা তাপমন্ডল মূলত ৫ টি ভাগে বিভক্ত। সমোষ্ণরেখা দ্বারা কোনো স্থানের তাপের বিন্যাস ও বৈশিষ্ট্য জানা যায়। এগুলো হলো- উষ্ণমন্ডল, উত্তর নাতিশীতোষ্ণমন্ডল, দক্ষিণ নাতিশীতোষ্ণ মন্ডল, উত্তর হিমমন্ডল এবং দক্ষিণ হিমমন্ডল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। কোনটি তাপের উৎস?

(ক) বায়ুপ্রবাহ (খ) বায়ুর চাপ (গ) সূর্যের অতি বেগুনি রশ্মি (ঘ) সূর্যালোক

২। বায়ু তাপের তারতম্যের কারণ কী?

i. বায়ুর উর্ধমুখী চলাচল ii. সূর্যরশ্মি তির্যক বা লম্বভাবে পড়া iii. বায়ুতে জলীয়বাষ্পের পরিমাণের ভিত্তি

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii খ. ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩। কোনটি দক্ষিণ নাতিশীতোষ্ণ মন্ডলের বৈশিষ্ট্য?

(ক) দক্ষিণে প্রচন্ড শীত

(খ) সারা বছর মধ্যম উষ্ণতা থাকে

(গ) মকরক্রান্তি থেকে কুমেরু পর্যন্ত সূর্যরশ্মি তির্যক বা লম্বভাবে পড়া

(ঘ) কর্কটক্রান্তি থেকে সুমেরুবৃত্ত পর্যন্ত সূর্যালোক লম্বভাবে বা তির্যকভাবে পড়া

পাঠ-৮.৩ চাপবলয় (Pressure Belt)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বায়ুচাপ ও চাপবলয় কাকে বলে তা বলতে পারবেন এবং
- চাপবলয়সমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

বায়ুর চাপ ও চাপবলয়

বায়ুর নিজের ওজোন রয়েছে। বায়ুর এ ওজোনের জন্য যে চাপ তৈরি হয় তাকে বায়ুচাপ বলা হয়। বায়ুচাপ সর্বত্র সমান নয়। কারণ ভূ-পৃষ্ঠের একেক অক্ষাংশে একেক ধরনের তাপমাত্রা লক্ষ্য করা যায়। বর্তুলাকার পৃথিবী যখন ক্রমাগত ঘুরতে থাকে তখন বায়ুমন্ডলের সবচেয়ে নিচের স্তরে যে চাপমন্ডল সৃষ্টি হয় সেগুলোকে বলা হয় চাপমন্ডল বা চাপবলয়। বায়ুর চাপবলয়গুলোকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- উচ্চচাপ বলয় এবং নিম্নচাপ বলয়। যে সকল অঞ্চলে বায়ুর চাপ বেশি সে অঞ্চলকে উচ্চচাপ বলয় এবং যে অঞ্চলে বায়ুর চাপ কম সে অঞ্চলকে নিম্নচাপ বলয় বলে। বায়ুর এ চাপ বলয়গুলো পৃথিবীর এক একটি অংশে ভূ-পৃষ্ঠকে বলয়ের ন্যায় পূর্ব-পশ্চিমে আবৃত করে অবস্থান করছে। এ ধরনের ৭টি চাপ বলয় রয়েছে। এর মধ্যে তিনটি নিম্নচাপ বলয় এবং চারটি উচ্চচাপ বলয়। নিম্নে চাপবলয়গুলো বর্ণনা করা হলো (চিত্র : ৮.৩.১)।

নিরক্ষীয় নিম্নচাপ বলয় : নিরক্ষরেখার উভয়পাশে ০° থেকে ৫° অক্ষাংশ পর্যন্ত যেখানে সূর্য লম্বভাবে কিরণ দেয়, সেই সকল স্থান নিয়ে এই বলয় বিস্তৃত। এই অঞ্চলে বায়ুর চাপ কম থাকে কারণ পাশের অঞ্চলগুলো থেকেও এই অঞ্চলের বায়ু উষ্ণ ও লঘু। এই বলয়কে নিরক্ষীয় নিম্নচাপ বলয় বলা হয়। এই বলয়ে বায়ুতাপ ঊর্ধ্বমুখী হওয়ার জন্য চাপের সৃষ্টি হয়।

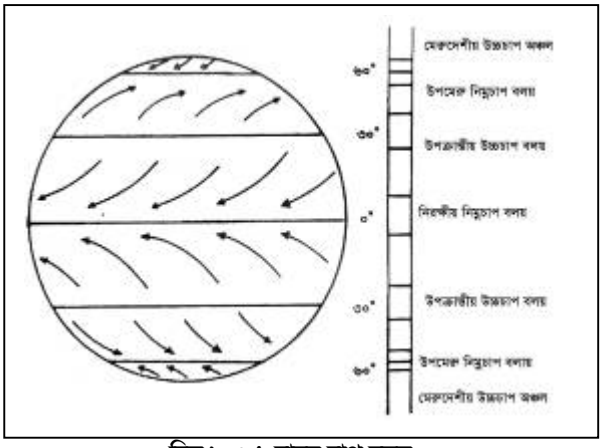

চিত্র ৮.৩.১ বায়ুর চাপ বলয়

ক্রান্তীয় উচ্চচাপ বলয় : নিরক্ষীয় উষ্ণ, আর্দ্র ও লঘু বায়ু উত্তর ও দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে শীতল হয়ে পড়ে। এই বায়ু অনবরত উপরে উঠতে থাকলেও নিচে নামতে পারে না। এই ঊর্ধ্বমুখী উষ্ণ বায়ু উত্তর ও দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে ২৫° থেকে ৩০° ক্রান্তীয় প্রদেশে এসে বায়ু শীতল ও ভারী হয়ে ক্রমাগত নিচে নামতে থাকে। উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষাংশের ২৫° থেকে ৩৫° মধ্যবর্তী এলাকায় যে দুটি উচ্চচাপ বলয়ের সৃষ্টি হয়েছে তাদের যথাক্রমে কর্কটীয় ও মকরীয় উচ্চচাপ বলয় বলা হয়।

উপ-মেরুবৃত্ত নিম্নচাপ বলয় : দুই মেরুবৃত্ত প্রদেশে পৃথিবীর আবর্তনের বেগ বেশি হওয়ার কারণে এ অঞ্চলের বায়ু ক্রান্তীয় অঞ্চলের দিকে সরে যায়। এই অবস্থায় দুই মেরুবৃত্ত অর্থাৎ ৬০° থেকে ৭০° অক্ষাংশের মধ্যে বায়ুর চাপ যখন কমে যায় তখন যে দুটি নিম্নচাপ বলয়ের সৃষ্টি হয় তাকে উপ-মেরুবৃত্তের নিম্নচাপ বলয় বলে।

মেরু অঞ্চলের উচ্চচাপ বলয় : যখন মেরু অঞ্চলের দুইটি উচ্চচাপ বলয় সৃষ্টি হয় তখন দুই মেরুর কাছাকাছি স্থানে প্রচন্ড শীতের জন্য বায়ু শীতল ও ভারী হয়। এই বলয় দুটিকে বলা হয় মেরু অঞ্চলের উচ্চচাপ বলয়। এই উচ্চচাপ বলয়দ্বয় থেকে বায়ু মেরুবৃত্তের নিম্নচাপ বলয়দ্বয়ের নিকট প্রবাহিত হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	চাপবলয়সমূহের বৈশিষ্ট্যগুলো লিখুন।

সারসংক্ষেপ

ক্রমাগত ঘূর্ণয়ণশীল পৃথিবীর অক্ষাংশের তাপমাত্রার পাথর্ক্যের জন্য বায়ুমন্ডলের নিম্নতম স্তরে চাপবলয়ের সৃষ্টি হয়েছে। প্রতিটি বলয়ের বায়ুর চাপের বৈশিষ্ট্য ভিন্ন। বায়ুতে দুই ধরনের চাপ বলয় রয়েছে। যথা- উচ্চচাপ বলয় এবং নিম্নচাপ বলয়। এর মধ্যে ৩টি নিম্নচাপ বলয় এবং ৪টি উচ্চচাপ বলয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√)চিহ্ন দিন।

১। ভূ-পৃষ্ঠে তাপের পার্থক্য হয় কী ভেদে?

(ক) ভূ-প্রাকৃতিক বিন্যাস ভেদে (খ) অক্ষাংশ ভেদে

(গ) বায়ুমন্ডল ভেদে (ঘ) দ্রাঘিমা ভেদে

২। নিরক্ষীয় নিম্নচাপ বলয়ের বৈশিষ্ট্য-

i. উষ্ণ ও লঘু বায়ুপ্রবাহ ii. শীতল বায়ুপ্রবাহ iii. নিরক্ষরেখার ০°- ৫° পর্যন্ত বিস্তৃত

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii খ. ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩। কোনটি উপ-মেরুবৃত্ত নিম্নচাপ বলয়ের অবস্থান কোথায়?

(ক) ২৫°- ৩০° অক্ষাংশে (খ) ০°- ৫° অক্ষাংশে

(গ) ৬০°- ৭০° অক্ষাংশে (ঘ) ২৫°- ৩৫° অক্ষাংশে

পাঠ-৮.৪ বায়ুপ্রবাহ (Air Movement)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বায়ুপ্রবাহের সংজ্ঞা, নিয়ামক ও ধরণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বায়ু প্রবাহ

বায়ু ও বাতাসের মধ্যে পার্থক্য আছে। চলমান বায়ু (Air) কে বাতাস (Wind) বলে। ভূ-পৃষ্ঠের ওপর দিয়ে বায়ু সবসময়ই একস্থান হতে অন্যস্থানে প্রবাহিত হয়। ভূ-পৃষ্ঠের সমান্তরাল অর্থাৎ আনুভূমিকভাবে বায়ুর এ সঞ্চালনকে বলা হয় বায়ু প্রবাহ। বায়ুচাপের পার্থক্যই বায়ুপ্রবাহের কারণ। বায়ু সাধারণত কয়েকটি বিশেষ নিয়ম দ্বারা পরিচালিত হয়-

১. নিম্নচাপমন্ডলের উত্তপ্ত ও হালকা বায়ু যখন উপরে উঠে যায় তখন বায়ুমন্ডলে চাপের অসমতা সৃষ্টি হয়। ফলে উচ্চ তাপমন্ডল থেকে শীতল ও ভারী বায়ু সবর্দা নিম্নচাপমন্ডলের দিকে প্রবাহিত হয়।

২. পৃথিবীর পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে আবর্তনশীল এবং নিরক্ষরেখা থেকে মেরু অঞ্চলের দিকে আবর্তনের কারণে বায়ুর গতিবেগ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পায়। এ কারণেই বায়ুপ্রবাহ উত্তর গোলার্ধের ডান দিকে ও দক্ষিণ গোলার্ধে বাম দিকে বেঁকে যায়। একে ফেরেলের সূত্র বলা হয়।

বায়ুপ্রবাহের নিয়ামক : বায়ুপ্রবাহ হলো বায়ুর সমতলীয় চাপের পাথর্ক্যের ফল। পৃথিবীর ঘূর্ণন গতি না থাকলে উচ্চচাপ থেকে নিম্নচাপের দিকে বায়ুর প্রবাহ সরল ও নিয়ত হত। বায়ুপ্রবাহের নিয়ামকগুলো নিম্নরূপ-

১. চাপের ক্রমাবনতি
২. কোরিওলিস প্রভাব
৩. কেন্দ্র বিমুখী বল
৪. ঘর্ষণ এবং
৫. মাধ্যাকর্ষণ শক্তি।

চাপের ক্রমাবনতি শক্তি : মাধ্যাকর্ষণ শক্তির দ্বারা পৃথিবীর দিকে বায়ুকে টেনে নামাতে চায়, যা বায়ুচাপ নামে পরিচিত। দুটি স্থানে এই চাপের মাত্রা ভিন্ন হতে পারে। নির্দিষ্ট দূরত্বে ভূ-পৃষ্ঠের দুটি স্থানের চাপের পার্থক্যই হচ্ছে চাপের ক্রমাবনতি। সাধারণত বায়ুর তাপমাত্রার পাথর্ক্যের সাথে সাথে চাপের পার্থক্য ঘটে এবং এর ফলে বায়ুর ঘনত্বেরও পরিবর্তন ঘটে। উষ্ণ বায়ুর ঘনত্ব কম হয় বলে তা উপরের দিকে উঠে যায় এবং সে কারণে ভূ-পৃষ্ঠে চাপ থাকে। উচ্চ অক্ষাংশে শীতল ও ভারী বায়ু এ সময় এই দিকে প্রবাহিত হয়। আবার শীতল ও ভারী বায়ু নিচের দিকে চাপ সৃষ্টি করে ও উচ্চচাপ অঞ্চলের দিকে প্রবহিত হয়ে শূন্যস্থান দখল করে। বায়ুপ্রবাহের সরল ও সাধারণ উদাহরণ হচ্ছে সমুদ্র বায়ু ও স্থল বায়ু।

কোরিওলিস প্রভাব : ফেরেলের সূত্রানুযায়ী বায়ু উত্তর গোলার্ধে ডান দিকে ও দক্ষিণ গোলার্ধে বাম দিকে বেঁকে প্রবাহিত হয়। বায়ুপ্রবাহের পরিবর্তনের এই শক্তিকেই বলা হয় কোরিওলিস প্রভাব/শক্তি। গোলার্ধভিত্তিক এই পরিবর্তন কোনো প্রবাহিত চলমান বস্তুর উপর পৃথিবীর ঘূর্ণন বলের প্রভাব বলে অনুমান করা যায়। এই দিক পরিবর্তনকারী শক্তি-

১. বায়ুপ্রবাহের দিক পরিবর্তনে প্রভাব ফেলে যা সর্বদা লম্বভাবে ক্রিয়া করে।
২. কোরিওলিস শক্তি বায়ুর গতির উপর কোনো প্রভাব ফেলে না।
৩. কোরিওলিসের প্রভাব মেরুতে সবচেয়ে বেশি এবং বিষুবীয় এলাকায় অস্তিত্ব লোপ পায়।

ঘর্ষণশক্তি : বায়ুপ্রবাহের গতিতে ঘর্ষণশক্তির প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ। বায়ু যখন ভূ-পৃষ্ঠের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয় তখন অসমতল ভূমিরূপের কারণে সংঘর্ষ ও ঘর্ষণের সৃষ্টি করে। ঘর্ষণ বলের মাত্রা ভূ-পৃষ্ঠের অসমতার উপর নির্ভরশীল।

আকাশচুম্বি অট্টালিকাসমৃদ্ধ নগরী অথবা পাহাড়ী অসমগঠনে ঘষর্ণ মাত্রা বেশি হয়। অন্যদিকে সমুদ্র পৃষ্ঠে বায়ুপ্রবাহ মসৃন তলের উপর কম ঘর্ষণের সৃষ্টি করে।
এছাড়াও মাধ্যাকর্ষণ ও কেন্দ্রবিমুখী বলও বায়ুপ্রবাহের উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রাখে।

শিক্ষার্থীর কাজ	বায়ুপ্রবাহের নিয়ামকসমূহের তালিকা তৈরি করুন।

সারসংক্ষেপ

বায়ুপ্রবাহ নিয়ত পরিবর্তনশীল। বায়ু চাপের পার্থক্যই বায়ুপ্রবাহের মূল কারণ। তবে বায়ুপ্রবাহের অন্যান্য নিয়ামকসমূহ বায়ু প্রবাহের গতি পরিবর্তন ও ধরণ বৈচিত্র্যে প্রভাব বিস্তার করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। নিচের তথ্যগুলো লক্ষ্য করুন-

i. বায়ুর উর্ধ্বদিক গমন করার প্রবনতা রয়েছে
ii. বায়ু সবর্দা গতিশীল
iii. বায়ুর তাপমাত্রা উর্ধমুখী হলে বায়ুর চাপও বৃদ্ধি পায়

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২। কোনটি কোরিওলিসের প্রভাবে হয় ?

(ক) বায়ুর চাপ বৃদ্ধি
(খ) বায়ুর গতি প্রবাহের পরিবর্তন
(গ) বায়ুর নিরক্ষীয় এলাকার লম্বভাবে পতিত হওয়া
(ঘ) বায়ুর দক্ষিণ গোলার্ধে ডান দিকে বেঁকে যাওয়া

৩। বায়ুর ঘর্ষণ বলের মাত্রা কীসের উপর নির্ভরশীল?

(ক) ভূ-পৃষ্ঠের অসমতার উপর
(খ) কোরিওলিস প্রভাবের উপর
(গ) বায়ুর গতির উপর
(ঘ) মাধ্যাকর্ষণ শক্তির উপর

পাঠ-৮.৫ বায়ুর আর্দ্রতা (Air Humidity)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বায়ুর আর্দ্রতা বলতে কী বুঝায় তা বলতে পারবেন এবং
- বায়ুর আর্দ্রতা পরিমাপ পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন।

বায়ুর আর্দ্রতা

নির্দিষ্ট পরিমাণ তাপ, চাপ ও আয়তনের বায়ুতে সর্বোচ্চ যে পরিমাণ জলীয়বাষ্প ধারণ করতে পারে সেই পরিমাণ জলীয়বাষ্পের উপস্থিতিকে সম্পৃক্ত অবস্থা বলা হয়। জলীয়বাষ্পজনিত বায়ুচাপ জলীয়বাষ্প চাপ নামে পরিচিত। বায়ুতে উপস্থিত এই জলীয়বাষ্প নানা কারণে হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে। যেমন-

১। তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে জলীয়বাষ্প বৃদ্ধি পায়। ২। চাপবৃদ্ধির সাথে জলীয়বাষ্প হ্রাস পায়।

বায়ুর আর্দ্রতা পরিমাপ পদ্ধতি : বায়ুর আর্দ্রতা পরিমাপের জন্য সংখ্যাতাত্ত্বিক মানে প্রকাশের ক্ষেত্রে দুটি পদ্ধতি উলে- খয্যেগ্য। এগুলো হলো-

আপেক্ষিক আর্দ্রতা (Relative Humidity) : নির্দিষ্ট পরিমাণ বায়ুতে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে যে পরিমাণ জলীয়বাষ্প উপস্থিত থাকে তার পরিমাণকে বলা হয় বায়ুর আপেক্ষিক আর্দ্রতা। আপেক্ষিক আর্দ্রতা দ্বারা বায়ুর চাপ বা তাপমাত্রার কোনো তারতম্য ঘটে না বরং তাপমাত্রা বেড়ে গেলে বায়ুতে জলীয়বাষ্প ধারণ ক্ষমতাও বাড়তে থাকে। এ কারণেই আপেক্ষিক আর্দ্রতার মান জলীয়বাষ্পের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া সাপেক্ষে তাপমাত্রার বৃদ্ধির ফলে বৃদ্ধি পায়। সাধারণত বায়ুতে যে পরিমাণ জলীয়বাষ্প উপস্থিত থাকে তার মান গ্রাম/কিলোগ্রামে প্রকাশ করা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, এই মান একক আয়তনের বায়ুর মধ্যে উপস্থিত জলীয়বাষ্পের পরিমাণকে বুঝায়। যেমন- এক কিলোগ্রাম বায়ুতে এক গ্রাম জলীয়বাষ্প আছে।

তুল্য আর্দ্রতা (Absolute Humidity) : কোনো নির্দিষ্ট আয়তনের বায়ুতে অবস্থিত জলীয়বাষ্পের প্রকৃত পরিমাপকে তুল্য আর্দ্রতা বলে। তুল্য আর্দ্রতা দুই পদ্ধতিতে পরিমাপ করা যায়। যথা- হাইগ্রোমিটার এবং সাইক্রোমিটার। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ২৫০° সে. তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত ১ কিলোগ্রাম বায়ুতে ২০ গ্রাম জলীয়বাষ্প থাকে। যদি কোনো সময়ের বায়ুতে উপস্থিত জলীয়বাষ্পের পরিমাণ ১০ গ্রাম হয় তবে ঐ সময়ের তুল্য আর্দ্রতা হবে ১০/২০ অথবা ৫০ শতাংশ। তুল্য আর্দ্রতার সাথে শিশিরাঙ্কের সম্পর্ক রয়েছে। যে তাপমাত্রার বায়ু জলীয়বাষ্পে সম্পৃক্ত হয় তা শিশিরাঙ্ক নামে পরিচিত। অর্থাৎ বায়ুতে উপস্থিত জলীয়বাষ্প দ্বারা ঐ বায়ুতে সম্পৃক্ত করতে হলে যে তাপমাত্রা পর্যন্ত শীতল করা প্রয়োজন সেই তাপমাত্রাকে শিশিরাঙ্ক (Dew Point) বলে। শিশিরাঙ্কের চেয়ে কম তাপমাত্রার বায়ুস্থ জলীয়বাষ্প শিশির (Dew) হিসেবে জমে যেতে পারে।

(শিক্ষার্থীর কাজ)	বায়ুর আর্দ্রতা কীভাবে পরিমাপ করা যায় তা ব্যাখ্যা করুন।

সারসংক্ষেপ

নির্দিষ্ট পরিমাণ তাপ, চাপ ও আয়তনে বায়ুর সর্বোচ্চ যে পরিমাণ জলীয়বাষ্প ধারণ করতে পারে সেই পরিমাণ জলীয়বাষ্পের উপস্থিতিকে বায়ুর আর্দ্রতা বলে। এই আর্দ্রতা প্রকাশ করা যায় দুইভাবে। যথা- বায়ুর আপেক্ষিক আর্দ্রতা ও তুল্য আর্দ্রতা। তুল্য আর্দ্রতাকে দুটি পদ্ধতি দ্বারা পরিমাপ করা যায়। যথা- হাইগ্রোমিটার এবং সাইক্রোমিটার।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৮.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। তুল্য আর্দ্রতা পরিমাপ পদ্ধতি হলো-

i. হাইক্রোমিটার ii. হাইগ্রোমিটার iii. সাইক্রোমিটার iv. সাইট্রোমিটার

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক) i ও ii (খ) ii ও iii গ i ও iii (ঘ) i ও iv

২। তুল্য আর্দ্রতার সাথে কীসের সম্পর্ক আছে ?

(ক) শিশিরাঙ্কের (খ) বায়ুর ঘনত্ব (গ) বায়ুর তাপমাত্রা (ঘ) কুয়াশা

পাঠ-৮.৬ কুয়াশা ও মেঘ (Fog and Cloud)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- কুয়াশা ও মেঘের সংজ্ঞা বলতে পারবেন এবং
- কুয়াশা এবং মেঘের গঠন ও শ্রেণিবিভাগ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

কুয়াশা

জলীয়বাষ্প যখন বায়ুস্তরের ভাসমান ধূলিকণাকে আশ্রয় করে ঘনীভূত হয়ে ধোঁয়ার আকারে ভাসতে থাকে তখন তাকে কুয়াশা বলে।

কুয়াশার বৈশিষ্ট্য : বায়ুর তাপমাত্রা শিশিরাংকের নিচে নেমে গেলে কুয়াশা সৃষ্টি হয়। বায়ুমন্ডলের বিকিরণ, তাপ পরিবহন এবং শীতল ও উষ্ণ বায়ুর সংমিশ্রণের ফলে কুয়াশা সৃষ্টি হয়। কুয়াশা মানবজীবনে ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় প্রকার প্রভাব বিস্তার করে । যেমন-

১। সামুদ্রিক জাহাজ, উড়োজাহাজ, সড়কপথে যান চলাচলে বিঘ্ন ঘটায়।

২। কুয়াশার জলকণা ভূ-পৃষ্ঠের বিকীর্ণ তাপকে শোষণ করে বায়ুকে উষ্ণ রাখে। তবে শীতপ্রধান দেশে কুয়াশা জন্য শস্যের ক্ষতি হয়।

৩। কুয়াশা ঘন হয়ে ইলশেগুড়ির মত জলকণা বর্ষণ হলে তাকে বলা হয় কুঞ্জঝটিকা।

কুয়াশার শ্রেণিবিভাগ : উৎপত্তির বিভিন্নতার উপর ভিত্তি করে কুয়াশাকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা-

১. বিকিরণজনিত কুয়াশা : শীতল ভূ-পৃষ্ঠের সংস্পর্শে এসে ভূমি সংলগ্ন আর্দ্র বায়ুস্তর যখন শীতল হয়ে যায় তখন বিকিরণজনিত কুয়াশার সৃষ্টি হয়। বায়ুপ্রবাহ যদি ঘন্টায় ৬-১০ মাইলের বেশি হয় তখন এই ধরনের কুয়াশা শিল্পনগরীতে বেশি দেখা যায়। কারণ ঐ সব এলাকায় বায়ুতে যে ধোঁয়া থাকে তা জলাকর্ষী কণা হিসেবে কাজ করে।

২. আনুভূমিক বায়ুসঞ্চালন ও বিকিরনজনিত কুয়াশা : উষ্ণ ও আর্দ্র বায়ু শীতল ভূ-পৃষ্ঠের উপর তাপ বিকিরণ করে শীতল হয়ে এই ধরনের কুয়াশার সৃষ্টি হয়। সমুদ্র উপকূল এবং বৃহৎ হ্রদে এই ধরনের কুয়াশা সৃষ্টি হয়। মেরু অঞ্চলে অনুসন্ধানকারীরা এই ধরনের বাষ্পীয় কুয়াশা দেখে উন্মুক্ত জলভাগ এড়িয়ে চলতে পারে।

৩. বায়ুপ্রাচীরজনিত কুয়াশা : ভিন্ন তাপ ও আর্দ্রতা বিশিষ্ট দুইটি পৃথক বৈশিষ্ট্যের বায়ুপুঞ্জ মিলিত হলে তাদের মধ্যবর্তী স্থানের ঢালু সীমান্তকে বলা হয়। বায়ুপ্রাচীর দুইটি বায়ুপুঞ্জের মধ্যে উষ্ণ বায়ুপুঞ্জ উপরে উঠে যায় এবং শীতল ও ঘনীভূত হয়ে বৃষ্টিপাত ঘটায়। বৃষ্টির ফলে নিচে অবস্থান করা শীতল বায়ুপুঞ্জ আরও জলীয়বাষ্প সংযোজন করে এবং এভাবে বায়ুপুঞ্জ যখন শীতল হয় তখন বায়ুপ্রাচীরজনিত কুয়াশার সৃষ্টি হয়।

মেঘ (Cloud)

বায়ুতে ভাসমান জলীয়বাষ্প কোনো কারণে শীতল হলে অতিক্ষুদ্র পানিকণা ও তুষার কণায় পরিণত হয়ে বায়ুমন্ডলের সূক্ষ্ম ধূলিকণায় আশ্রয় নিয়ে ভেসে বেড়ায়। বাতাসে ভাসমান এরূপ ছোট ছোট পানিকণা বা তুষারকণাকে মেঘ বলে (চিত্র ৮.১.৫)।

চিত্র-৮.১.৫ : মেঘ

মেঘ সৃষ্টির প্রক্রিয়া হয় (Process of Cloud Formation) : আমাদের চতুর্দিকের বায়ুতে সর্বদা জলীয়বাষ্প থাকে। নদ-নদী, সমুদ্র, হ্রদ, জলাশয়, বৃক্ষ প্রভৃতি হতে বাষ্পীভবনের দ্বারা বায়ু জলীয়বাষ্প গ্রহণ করে থাকে। বায়ু অপেক্ষা জলীয়বাষ্প হাল্কা হওয়ায় জলীয়বাষ্প ঊর্ধ্বে উঠে যায়। বায়ুমন্ডলের ঊর্ধ্বভাগ অপেক্ষাকৃত শীতল এবং বায়ুর চাপ কম। জলীয়বাষ্প বেশি চাপ হতে কম চাপে নীত হলে তা আয়তনে বেড়ে যায় এবং অপেক্ষাকৃত শীতল হয়। এ কারণে বায়ু

উর্ধ্বে উঠলে শীতল হয় এবং জলীয়বাষ্প পানিকণা বা বরফ কণায় পরিণত হয়। এ পানিকণা বা বরফকণা হালকা বলে আকাশে ভাসমান ধূলিকণায় আশ্রয় নিয়ে ভেসে বেড়ায় এবং মেঘের সৃষ্টি হয়।

মেঘের প্রকারভেদ (Types of Couds) : উচ্চতা অনুসারে মেঘকে তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়। যথা–

ক. উঁচু মেঘ
খ. মধ্যম উঁচু মেঘ এবং
গ. নিচু মেঘ।

ক. উঁচু মেঘ (High Cloud) : উঁচু মেঘের উচ্চতা সাধারণত ৬,০০০ মিটার হতে ১২,০০০ মিটার।

খ. মধ্যম উঁচু মেঘ (Medium High Cloud) : এ মেঘ ২,০০০ হতে ৬,০০০ মিটার উচ্চতায় উৎপন্ন হয়।

গ. নিচু আকাশের মেঘ (Low Colud) : ভূ-পৃষ্ঠের নিকটবর্তী অঞ্চলে ২,০০০ মিটারের মধ্যে এ জাতীয় মেঘ গঠিত হয়। এটি অপেক্ষাকৃত ভারী বলে আকাশের নিচে ভেসে বেড়ায়।

শিক্ষার্থীর কাজ	কুয়াশার বৈশিষ্ট্য ও শ্রেণিবিভাগ করুন।

সারসংক্ষেপ

পৃথিবী পৃষ্ঠের নিকটবর্তী ভাসমান স্তর মেঘের মত জলকণাকে বলা হয় কুয়াশা। অন্যদিকে জলীয়বাষ্প ঘনীভূত হয়ে মেঘ সৃষ্টি হয়। কুয়াশা ও মেঘ তাদের গঠনগত বৈশিষ্ট্যের জন্য কয়েকটি শ্রেণিতে বিভক্ত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। কুয়াশা দেখতে কীসের মত ?
(ক) মেঘের মত (খ) ধূলিকণার মত
(গ) বৃষ্টির মত (ঘ) ধোঁয়ার মত

২। *আনুভূমিক বায়ুসঞ্চালন ও বিকিরণজনিত কুয়াশার বৈশিষ্ট্য-*
i. উষ্ণ ও উর্দ্র বায়ু ভূ-পৃষ্ঠে তাপ বিকিরণ করে শীতল হয়ে যায়।
ii. শুষ্ক ও শীতল বায়ু সমুদ্রে পৃষ্ঠে পতিত হয়।
iii. হঠাৎ বারিপাত এবং শিশির কণা উষ্ণ হয়ে যাওয়া।
iv. সমুদ্র উপকূল ও বৃহৎ হ্রদে এই ধরনের কুয়াশা দেখা যায়।
নিচের কোনটি সঠিক ?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii গ i ও iii (ঘ) i ও iv

৩। কোনটি মেঘের বৈশিষ্ট্য নয়?
(ক) মেঘ ও বজ্রঝড় একই বস্তু নয় (খ) মেঘ অসংখ্য জলকণা ও বরফকণার সৃষ্টি
(গ) মেঘ হলো জলীয়বাষ্পের ঘনীভূত রূপ (ঘ) মেঘ হলো তুষারকণার সাথে কুয়াশার মিলিত রূপ

৪। মেঘকে প্রধানত কয়ভাগে ভাগ করা যায় ?
(ক) ৩ (খ) ৪
(গ) ৫ (ঘ) ৬

পাঠ ৮.৭ বৃষ্টিপাত (Rainfall)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বৃষ্টিপাতের সংজ্ঞা বলতে পারবেন এবং
- বৃষ্টিপাতের শ্রেণিবিভাগ ও পরিমাপ পদ্ধতিগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বৃষ্টিপাত

জলীয়বাষ্পপূর্ণ বায়ু উপরে উঠে শীতল হয়ে যায় ও ঘনীভূত হয়ে মেঘে পরিণত হয়। এই মেঘের মধ্যে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পানির কণা থাকে তা মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টানে ভূ-পৃষ্ঠে পতিত হয়। মূলত পানির কণাগুলো যখন বড় বড় কণায় পরিণত হয়ে ভূ-পৃষ্ঠে নেমে আসে তাকেই বলা হয় বৃষ্টিপাত।

সমুদ্র, নদ-নদী, জলাশয়, উদ্ভিদ প্রভৃতি থেকে পানি জলীয়বাষ্পে পরিণত হয়। বাষ্পীভবন (Evaporation) প্রক্রিয়ার একটি নির্দিষ্ট উষ্ণতায় বায়ুর জলীয়বাষ্প ধারণ ক্ষমতা নির্দিষ্ট। যেমন- ১০° সেলসিয়াস উত্তাপে প্রতি ঘনমিটার বায়ু ৯.৪১ গ্রাম বাষ্প ধারণ করে এবং এই অবস্থাকে বলা হয় বায়ুর সম্পৃক্ত। বায়ুর তাপমাত্রা ১০° সেলসিয়াস থেকে কম হলে তার জলীয়বাষ্প ধারণ ক্ষমতাও হ্রাস পায়। এই ধরনের ঘনীভবনের (Condensation) সাহায্যে অতিরিক্ত জলীয়বাষ্প বৃষ্টিপাত ঘটায়। বৃষ্টিপাত কঠিন ও তরল দুই ধরনেরই হতে পারে। জলীয়বাষ্পের শিশিরাংক যদি শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াস বা হিমাংকের নিচে নেমে যায় তখন জলীয়বাষ্প তুষার ও বরফরূপে ভূ-পৃষ্ঠে পতিত হয়। আবার হিমাংক শিশিরাংকের ওপর থাকলে ঘনীভবনের মাধ্যমে শিশির, কুয়াশা বা বৃষ্টি আকারে পৃথিবী পৃষ্ঠে নেমে আসে।

বৃষ্টিপাতের শ্রেণিবিভাগ : ৪টি উপায়ে জলীয়বাষ্পপূর্ণ বায়ু ঊর্ধ্বাকাশে উত্থিত হয়ে বৃষ্টিপাত ঘটায় বলে বৃষ্টিপাতকে প্রধানত ৪টি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

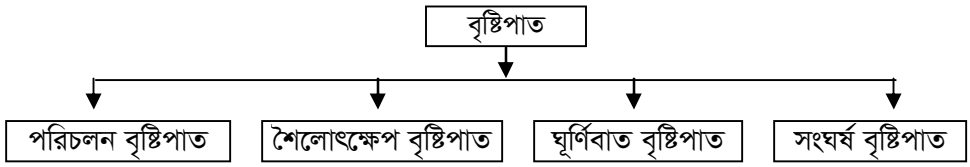

১. পরিচলন বৃষ্টিপাত (Conventional Rainfall) : ভূ-পৃষ্ঠের বায়ু উষ্ণ হলে জলীয়বাষ্প সম্পন্ন হালকা বায়ু উপরে উঠে যায়। এ সময়ে শীতল বায়ুর সংস্পর্শে এসে ঐ জলীয়বাষ্প প্রথমে মেঘ ও পরে বৃষ্টিতে পরিণত হয়ে নিচে নেমে আসে। এই বৃষ্টিপাতকে বলা হয় পরিচলন বৃষ্টিপাত। পরিচলন বৃষ্টিতে বায়ুর তাপ হ্রাস পেয়ে যখন অতিরিক্ত জলীয়বাষ্প ঘনীভূত হয় তখন এ ধরনের বৃষ্টিপাত ঘটায়। নিরক্ষীয় নিম্নচাপ এলাকায় পরিচলন বৃষ্টিপাত বেশি হয় কারণ এসব এলাকার ঊর্ধ্বগামী বায়ুতে প্রচুর জলীয়বাষ্পপূর্ণ বায়ু থাকে। নিরক্ষীয় এলাকায় স্থলভাগের থেকে জলভাগের বিস্তৃতি বেশি এবং এখানে লম্বভাবে সূর্যকিরণ পতিত হয়। এই অঞ্চলে হালকা জলীয়বাষ্পপূর্ণ বায়ু থাকে। হালকা জলীয়বাষ্পপূর্ণ বায়ু যখন শীতল বায়ুর সংস্পর্শে আসে তখন পরিচলন বৃষ্টিপাত ঘটায়। নিরক্ষীয় অঞ্চলে প্রায় সারা বছরই বিকেলে ও সন্ধ্যায় এ ধরনের বৃষ্টি হয়। নাতিশীতোষ্ণ মন্ডলে গ্রীষ্মকালের শুরুতে পরিচলন বৃষ্টিপাত হয়।

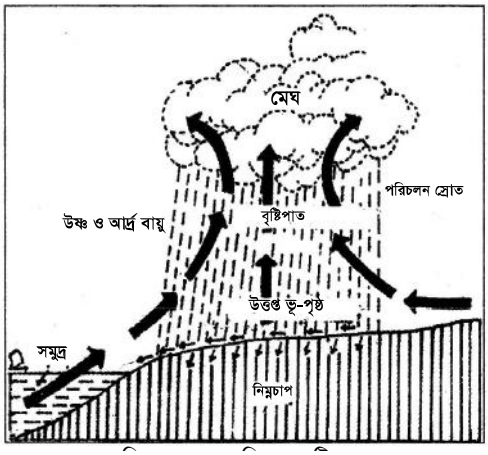

পরিচলন বৃষ্টি নিম্নলিখিত পর্যায় অনুসারে ঘটে থাকে-

- সূর্যের তাপে ভূ-পৃষ্ঠ দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে উঠে।
- ভূ-পৃষ্ঠের উপরে অবস্থিত উষ্ণ ও হালকা বায়ু উপরে উঠে গিয়ে পরিচলনের সৃষ্টি করে।
- ঊর্ধ্বমুখী বায়ু যখন শীতল হতে থাকে তখন বায়ুতে যথেষ্ট পরিমাণ জলীয়বাষ্পের উপস্থিতিতে ঘনীভবন হয়।
- ঘনীভবনের ফলে মেঘ উপরের দিকে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে ঝড়োপুঞ্জ মেঘের সৃষ্টি করে। এ ধরনের মেঘ থেকে ঝড়সহ মুষলধারে বৃষ্টি এবং কখনো কখনো শিলাবৃষ্টি ও বজ্রপাত হয় (চিত্র- ৮.৭.১)।

২. **শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টিপাত (Orogaphic Rainfall) :** জলীয়বাষ্পপূর্ণ উষ্ণ ও আর্দ্র বায়ু ভূ-পৃষ্ঠের উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময় পর্বতে বাধাপ্রাপ্ত হলে তা পর্বতের ঢাল বেয়ে উপরের দিকে উঠে যায়। এই বায়ু শীতল হয়ে পর্বতের প্রতিবাত ঢালে যে বৃষ্টিপাত ঘটায় তাকে শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টিপাত বলে (চিত্র-৮.৭.২)। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু মেঘালয় পাহাড়ে বাধা পাওয়ায় সিলেট এলাকায় প্রচুর শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টি হয়। তবে পর্বত অতিক্রমকারী বায়ু যদি পর্বতের অপর পাশে অর্থাৎ অনুবাত ঢালে পৌঁছায় তখন ঐ বায়ুতে জলীয়বাষ্প কম থাকে। ঐ বায়ু নিচে নামার ফলে আরও উষ্ণ এবং শুষ্ক হয়ে উঠায় ঐ স্থানে বৃষ্টিপাত হয় না। এই বৃষ্টিহীন স্থানকে বলা হয় বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চল (Rain-Shadow Region)।

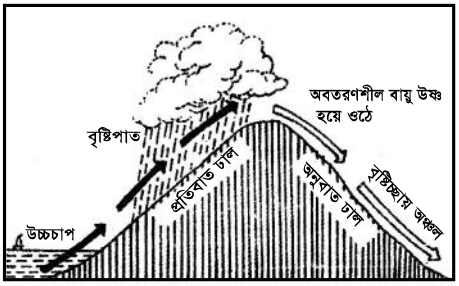

চিত্র-৮.৭.২: শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টিপাত

৩. **ঘূর্ণিবাত বৃষ্টি (Cyclonic Rainfall):** ঘূর্ণিবাত কেন্দ্রের বায়ু যখন উপরে উঠে যায় তখন তাপমাত্রা হ্রাস পায় ও শীতল হয়। এ সময় বায়ুতে থাকা জলীয়বাষ্প অতিরিক্ত ঘনীভূত হয়ে ঘূর্ণিবাত বৃষ্টিপাত ঘটায় (চিত্র-৮.৭.৩)।

৪. **সংঘর্ষ বৃষ্টিপাত (Frontal Rainfall):** শীতল ও উষ্ণ বায়ুপুঞ্জ যখন মুখোমুখি হয় তখন শীতল বায়ুর সংস্পর্শে উষ্ণ বায়ুর তাপমাত্রা হ্রাস পায় এবং শিশিরাঙ্কে পৌঁছায়। পরে আরও ঘনীভূত হয়ে বায়ুপুঞ্জ সংযোগস্থলে বৃষ্টিপাত ঘটায়। এই প্রকার বৃষ্টি সংঘর্ষ বৃষ্টিপাত নামে পরিচিত। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে এই ধরনের বৃষ্টি দেখা যায় (চিত্র-৮.৭.৪)।

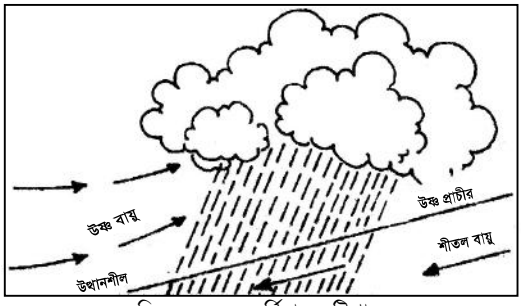

চিত্র-৮.৭.৩ : ঘূর্ণিবাত বৃষ্টিপাত

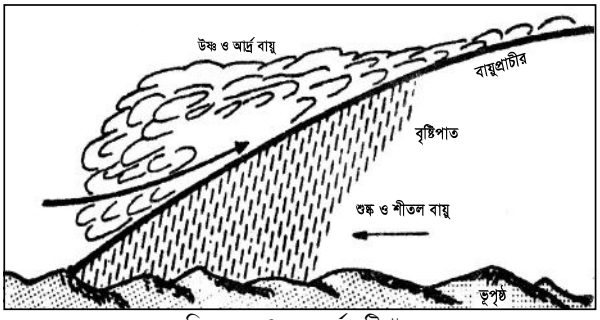

চিত্র-৮.৭.৪ : সংঘর্ষ বৃষ্টিপাত

বৃষ্টিপাতের পরিমাপ : বৃষ্টিপাত সহজেই পরিমাপ করা যায় বৃষ্টি মাপনী যন্ত্র (Rain Gauge) দিয়ে। সময়ের সাথে বৃষ্টিপাতের তীব্রতা পরিমাপের জন্য বিভিন্ন ধরনের অত্যাধুনিক মাপনী যেমন- ওজোন মাপনী, টিপি, বাকেট মাপনী ব্যবহার করা হয়। বৃষ্টি মাপনী একটি তামারতলা যুক্ত খোলা মুখবিশিষ্ট চোঙ যার ভিতরে একটি ফানেলসহ কাঁচের পাত্র বসানো থাকে। মূল তামার চোঙটি মাটিতে এমনভাবে বসানো থাকে যাতে এর ওপরের অংশ ৩০ সেন্টিমিটার মাটির ওপরে থাকে। কাচের পাত্রে দাগ দেয়া থাকায় যে পানি সংগ্রহ করা হয় তার পরিমাণ সহজেই পরিমাপ করা যায়। বর্ষাকালে প্রতি ২৪ ঘন্টায় কয়েকশবার মাপনী যন্ত্র খালি করা হয়। এই মাপনী যন্ত্রটি খোলা জায়গায় বসানো হয় যাতে কোনো দালানের পানি বা গাছের মাধ্যমে পানি চুইয়ে পাত্রে জমা না হয়। এছাড়াও ফানেলের উপস্থিতির জন্য সূর্যালোকও সরাসরি প্রবেশ করে না এবং বাষ্পীভবনও ঘটে না। বৃষ্টিপাত পরিমাপের সময় খেয়াল রাখতে হবে-

১। মাপনীর কাছে বায়ু আড়াল থাকবে কারণ বায়ু ও বায়ুপ্রবাহ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বৃষ্টিপাত পরিমাপে বাধা সৃষ্টি করে।
২। বৃষ্টিপাত মাপনীযন্ত্র উন্মুক্ত স্থানে রাখা হয়।
৩। তুষারপাত পরিমাপের জন্য পুরুত্ব ও পানির সমতাকে পরিমাপ করা হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	বৃষ্টিপাত মাপনী যন্ত্র সম্পর্কে লিখুন।

সারসংক্ষেপ

জলীয়বাষ্পপূর্ণ বায়ু ঘনীভূত হয়ে বৃষ্টিপাত সংঘটিত হয়। বৃষ্টিপাতকে চারটি ভাগে ভাগ করা যায়। এগুলো হলো- পরিচলন বৃষ্টিপাত, শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টিপাত, ঘূর্ণিবাত বৃষ্টিপাত এবং সংঘর্ষ বৃষ্টিপাত। বৃষ্টি মাপনী যন্ত্র দ্বারা বৃষ্টিপাত পরিমাপ করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। নদ-নদী, সমুদ্রের পানি থেকে কোন প্রক্রিয়ায় জলীয়বাষ্প সৃষ্টি হয়?
(ক) বারিপাত (খ) ঘনীভবন
(গ) তুষারপাত (ঘ) বাষ্পীভবন

২। বর্ষাকালে বৃষ্টিপাত মাপনের যন্ত্রটিতে কতবার পানি পরিবর্তন করা হয় ?
(ক) ১ দিনে ৬ বার (খ) ৩ দিন পর পর
(গ) ১ দিনে কয়েকশ বার (ঘ) ১ দেড় মিনিট পর পর

৩। আধুনিক পদ্ধতিতে বৃষ্টিপাত পরিমাপ করা হয় কোন যন্ত্রের দ্বারা ?
(ক) পানি সমতা মাপনী (খ) ওজোন মাপনী
(গ) টিপিং বাকেট মাপনী (ঘ) রেইন ড্রপ বাকেট মাপনী

পাঠ-৮.৮ কালবৈশাখী (The Nor'wester)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- কালবৈশাখী ঝড় ও এর বৈশিষ্ট্যগুলো বলতে পারবেন।

কালবৈশাখী

বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের ধ্বংসাত্মক প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে কালবৈশাখী ঝড় সুপরিচিত। কালবৈশাখী ঝড় বায়ুপ্রবাহ ও ভারী বৃষ্টিপাতের সাথে সংঘটিত হয়। কালবৈশাখী ঝড় ভারী বৃষ্টিপাত ও বজ্রসহ ভূ-পৃষ্ঠের উপর আঘাত হানে। এতে ঘর-বাড়ি, গাছ-পালা, ফসলি জমি ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং মানুষ ও পশু-পাখি মারা যায়। বাংলাদেশের ঢাকায় ২০১৫ সালের ১৪ এপ্রিলে সংঘটিত কালবৈশাখী ঝড়ে অন্তত ২৪ জন মানুষ মারা গেছে ও শতাধিক মানুষ আহত হয়েছে। মধ্য এপ্রিল থেকে মধ্য মে মাসের মধ্যে কালবৈশাখী ঝড় তীব্র রূপ ধারণ করে। মূলত আর্দ্র ও শুষ্ক বায়ুপুঞ্জ পরস্পর মুখোমুখি হলে এইরূপ কালবৈশাখী ঝড়ের সৃষ্টি হয়। কালবৈশাখী সাধারণত বাংলাদেশের মধ্যভাগে বিশেষ করে ঢাকা, পাবনা, ফরিদপুর এলাকায় আঘাত হানে। কালবৈশাখীর গতি প্রতি ঘণ্টায় ৪০ হতে ৮০ কিলোমিটার। অনেক সময় এ ঝড়ের গতি ঘণ্টায় ১২৮ কিলোমিটারেরও বেশি হয়ে থাকে। কালবৈশাখী মূলত ভূমিতে আঘাত হানে তবে এর প্রভাব সাইক্লোনের থেকে তুলনামূলক কম ধ্বংসাত্মক। মার্চ মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত বাংলাদেশের তাপমাত্রা পূর্ববর্তী মাসগুলির (শীতকালের মাসগুলি) তুলনায় দ্রুত বাড়তে থাকে। এপ্রিল মাসের মাঝামাঝিতে সারা দেশে বিশেষ করে দেশের উত্তর-পশ্চিমাংশে দৈনিক তাপমাত্রা সর্বোচ্চ পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। বায়ুমন্ডলের নিম্নস্তরে উষ্ণ ও আর্দ্র বায়ুর উপস্থিতি কালবৈশাখী সৃষ্টির অপরিহার্য পূর্বশর্ত। অস্থিতিশীল বায়ুমন্ডল আর দ্রুত পরিচলন ক্রিয়া কালবৈশাখীর উৎপত্তি ও বৃদ্ধির জন্য গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক।

কালবৈশাখীকে বায়ুপুঞ্জ বজ্রঝড় অথবা পরিচলনগত বজ্রঝড় নামেও আখ্যায়িত করা যায়। বাংলাদেশে কালবৈশাখী সৃষ্টির প্রধান কারণ দেশের দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে আসা উষ্ণ ও আর্দ্র বায়ু যা ঊর্ধ্বে ২ কিলোমিটার পর্যন্ত আরোহন করে থাকে এবং এ উষ্ণ ও আর্দ্র বায়ু উত্তর-পশ্চিম এবং পশ্চিম দিক থেকে আসা অপেক্ষাকৃত শীতল ও শুষ্ক বায়ুর সঙ্গে মিলিত বা মুখোমুখি হয়। উষ্ণ ও আর্দ্র বায়ু ছোটনাগপুর মালভূমিতে সৃষ্টির পর পূর্বদিকে ধাবিত হয়ে বাংলাদেশের সীমায় উপস্থিত হয়। বিপরীতধর্মী ও অসম এ দু বায়ুপ্রবাহের মুখোমুখি হওয়ার ফলে প্রাক-কালবৈশাখীর সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশ এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গে বজ্র-বিদ্যুৎপূর্ণ ঝড় সৃষ্টি হয়। এই ঝড় বৈশাখ মাসে কখনও চৈত্র মাসে উত্তর-পশ্চিম দিক হতে আসে বলে একে কালবৈশাখী ঝড় বা গ্রীষ্মকালীন উত্তর পশ্চিম ঝড় বা বজ্রবিদ্যুৎপূর্ণ ঝড়বৃষ্টি বলা হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	কালবৈশাখী ঝড় সর্ম্পকে লিখুন।

সারসংক্ষেপ

কালবৈশাখী ঝড় এমনই প্রাকৃতিক দুর্যোগ যা প্রায় প্রতিবছর বাংলাদেশে আঘাত হানে। আর্দ্র ও শুষ্ক বায়ুপুঞ্জের মুখোমুখি সংঘর্ষের ফলাফল এই ঝড় অত্যন্ত ধ্বংসাত্বক প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এর ফলে জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। কোনটি কালবৈশাখী ঝড়ের বৈশিষ্ট্য?

(ক) গুড়িগুড়ি বৃষ্টি ও বজ্রপাত
(খ) ভারী বৃষ্টিপাত ও ঝড়ো বায়ুপ্রবাহ
(গ) বজ্রপাত ও টানা বৃষ্টিপাত
(ঘ) সমুদ্র উপকূলে ঝড়ের আঘাত

২। কালবৈশাখী ঝড় কোথায় আঘাত হানে?

(ক) নদীতে (খ) ফসলি জমিতে (গ) সমুদ্রে (ঘ) ভূমিতে

পাঠ-৮.৯ ঘূর্ণিঝড় (Cyclone)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ঘূর্ণিঝড়ের উৎপত্তি ও বৈশিষ্ট্য বলতে পারবেন এবং
- ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

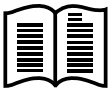

ঘূর্ণিঝড়

ঘূর্ণিঝড় হলো একটি অন্যতম প্রাকৃতিক দুর্যোগ যা প্রাকৃতিক পরিবেশ, মানুষ ও প্রাণিজগতের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করে। সারা বিশ্বে ঘূর্ণিঝড় নানা নামে পরিচিত। যেমন- চীন ও জাপানের উপকূলে টাইফুন, ভারত মহাসাগরে সাইক্লোন, ফিলিপাইনের উপকূলে বাগুই, অস্ট্রেলিয়ার উপকূলে উইলি উইলিছ, ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ ও মেক্সিকো উপসাগর অঞ্চলে হারিকেন প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়।

উৎপত্তি : অনিয়মিত বায়ুর উৎকৃষ্ট উদাহরণ হলো ঘূর্ণিঝড় (Cyclone) ও প্রতীপ ঘূর্ণিঝড় (Anti-cyclone)। উপরের ও নিচের বায়ুর পারস্পরিক ক্রিয়ার মাধ্যমে এই ঘূর্ণিঝড় সংঘটিত হয়। আমাদের দেশে প্রায় প্রতি বছর সাধারণত মার্চ ও নভেম্বর মাসে ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে।

ঘূর্ণিঝড়ের বৈশিষ্ট্যসমূহ : ঘূর্ণিঝড়ের সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হলো-

- ঘূর্ণিঝড়ের সময় পশ্চিমা বায়ু প্রবাহ দ্বারা মধ্য অক্ষাংশ অঞ্চলের নিম্নচাপ ও উচ্চচাপ পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়।
- এই ঝড়ের সময় বায়ুপ্রবাহের গতিবেগ ঘন্টায় ৬৫ কি.মি বা তারও বেশি হয়। এছাড়াও নিম্নচাপ সৃষ্টি হয়।
- দ্রুত উর্দ্ধগামী বায়ু জলীয়বাষ্পপূর্ণ থাকলে ঘূর্ণিঝড়ের সময় প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়।
- উত্তর গোলার্ধে প্রবল ঘূর্ণিবায়ু বাইরের থেকে কেন্দ্রের দিকে প্রবাহিত হয়। পরে প্রচন্ড শক্তিতে বায়ু আবর্তনের মাধ্যমে উপরের দিকে উঠতে থাকে।
- ঘূর্ণিঝড়ের বায়ু আবর্তনের কেন্দ্রকে চোখ বলা হয়।
- মধ্য অক্ষাংশে গড়ে প্রতিদিন ৫০-৬০ টি চলমান নিম্নচাপ সৃষ্টি হয় এবং অন্য দিকে সারা পৃথিবীতে প্রতি বছর গড়ে ৮০ টির মত ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হয়।
- ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড় সমূহের ব্যাস ২০০-৭০০ কি.মি হয় এবং গভীরতা হয় ১২-১৬ কি.মি পর্যন্ত।
- ঘূর্ণিঝড়ের সময় কেন্দ্রের ভিতরের দিকে বায়ুচাপ দ্রুত কমতে থাকে।
- ঘূর্ণিঝড় প্রলয়ঙ্করী দুর্যোগ বয়ে আনে।
- ঘূর্ণিঝড় উষ্ণ জলরাশি থেকে সৃষ্টি হয় যার গড় উষ্ণতা ২৭° সেলসিয়াস।

ঘূর্ণিঝড়ের গঠন : ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হতে হলে কিছু বৈশিষ্ট্য বা উপাদান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এগুলো হলো-

ক) সমুদ্র পৃষ্ঠের কাছাকাছি অন্তত ২৭° সেলসিয়াস তাপমাত্রা বিশিষ্ট যথেষ্ট পরিমাণে উষ্ণ ও আর্দ্র বায়ু থাকে।
খ) মুষলধারে বৃষ্টিপাত হয় এবং বায়ুপ্রবাহের ভেতরে এবং উপরের দিকে খাড়া হয়ে মেঘপুঞ্জের সৃষ্টি হয়।
গ) ঊর্দ্ধস্তরের বায়ু বহির্গামী হবে।

উপরিউক্ত শর্তসমূহ ঘূর্ণিঝড় সংগঠনে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। প্রধানত উত্তর ও দক্ষিণ অয়ন বায়ু যে বায়ুপুঞ্জ বয়ে আনে এবং ঐ বায়ুপুঞ্জ যেখানে মিলিত হয় ঐ স্থানেই ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি করে। ঘূর্ণিঝড় সাধারণত সমুদ্রের উপর ও আন্তঃক্রান্তীয় এলাকায় সংঘটিত হয়। সমুদ্রের উপর দিয়ে বয়ে আসা যে বায়ুপুঞ্জ তা হতে বায়ুর নিম্নস্তরের উষ্ণ ও আর্দ্র বায়ু এবং উপরের শীতল ও শুষ্ক বায়ুর মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এসময় একটি স্তর অন্য স্তরের উপরে উঠে যায়। এই উপরের দিকে উঠে যাওয়া বায়ু যখন শীতল হয়ে যায় তখন আর্দ্রতা ঘনীভূত হয়ে বৃষ্টিপাত ঘটায়। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড়ের সময় বায়ু প্রবাহ পশ্চিম দিক থেকে প্রবাহিত হয়। এই ঘূর্ণনশক্তি জন্য ঘূর্ণিঝড় ভূমিতে পৌঁছায়, তখন উষ্ণ ও আর্দ্র বায়ু প্রবাহ বন্ধ হয়ে এটি ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে যায় এবং একসময় নিঃশেষ হয়ে পড়ে।

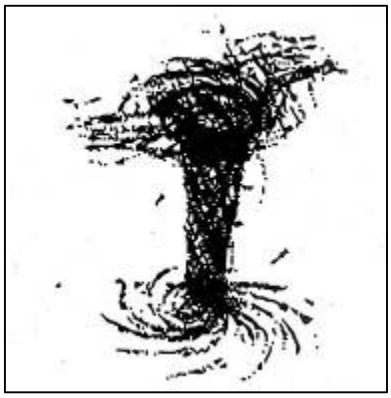

চিত্র-৮.৯.১:ঘূর্ণিঝড়

ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব

ঘূর্ণিঝড় এমনই এক প্রাকৃতিক বিপর্যয় যা প্রাকৃতিক পরিবেশে ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে। ঘূর্ণিঝড়ের সবচেয়ে বড় প্রভাব ঘটে আবহাওয়াতে। ঘূর্ণিঝড় শুরু হওয়ার আগে বায়ু শান্ত, উষ্ণ ও আর্দ্র থাকে। তবে ঘূর্ণিঝড়ের অগ্রবর্তী অংশে পৌঁছাবার সঙ্গে সঙ্গে দমকা বাতাস ও ঘন ঘন মেঘ দেখা যায়। ঘূর্ণিঝড়ের মূল অংশ যখন আসে তখন প্রবল ঝড়ো হাওয়া ও ঘন মেঘসহ মুষলধারে বৃষ্টি হয়। আর কেন্দ্রের ভিতরে অবস্থানকারী চোখ শান্ত আবহাওয়া পরিস্থিতি তৈরি করে। ঘূর্ণিঝড়ের পশ্চাৎভাগে পৌঁছানোর পর আবারও ঘন মেঘ, বৃষ্টিপাত ও ঝড়ো হাওয়া প্রবাহিত হয়। এ সময় বায়ু অগ্রবর্তী ঘূর্ণিঝড়ের বিপরীত দিক থেকে প্রবাহিত হয়। ঘূর্ণিঝড় মানুষ ও জানমালের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে।

শিক্ষার্থীর কাজ	ঘূর্ণিঝড় কীভাবে সংঘটিত হয় লিখুন।

সারসংক্ষেপ

অনিয়মিত বায়ুর একটি উদাহরণ হলো ঘূর্ণিঝড়। ঘূর্ণিঝড় মূলত ঊর্দ্ধমুখী শীতল ও শুষ্ক বায়ু এবং নিম্নমুখী উষ্ণ ও আর্দ্র বায়ুর মুখোমুখি সংঘর্ষে সংঘটিত হয়। ঘূর্ণিঝড় বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে ধ্বংসাত্বক প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলে পরিচিত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৯

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ঘূর্ণিঝড়ের বৈশিষ্ট্য হলো-

i. প্রবল নিম্নচাপের ফলে ঘূর্ণিঝড় হয় ii. ঘূর্ণিঝড় নিয়মিত বায়ুর একটি উদাহরণ। iii. ঘূর্ণিঝড় মাটির উপর সৃষ্টি হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২। ঘূর্ণিঝড়ের আবর্তন কেন্দ্রকে কি বলে?

(ক) বায়ুপুঞ্জ (খ) চোখ (গ) মেঘপুঞ্জ (ঘ) মুখ

৩। রফিকের বাড়ি উপকূলের কাছাকাছি। সে তার বন্ধু মুক্তাকে বলল ঘূর্ণিঝড়ের সময় তাদের ঘরবাড়ি ভেঙে গেছে। এ সময় প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়েছে এবং এপ্রিল মে মাসে প্রায়ই তারা এমন দুর্যোগের মুখোমুখি হয়।

উদ্দীপকের আলোকে ঘূর্ণিঝড়ের কোন এলাকার বৈশিষ্ট্যকে বুঝানো হয়েছে?

(ক) মকরক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড় (খ) ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড় (গ) কর্কটক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড় (ঘ) মধ্য অক্ষাংশের ঘূর্ণিঝড়

৪। ঘূর্ণিঝড়ের আগে বায়ু কেমন থাকে?

(ক) শীতল (খ) শুষ্ক ও ঝড়ো (গ) শীতল ও আর্দ্র (ঘ) উষ্ণ ও আর্দ্র

পাঠ-৮.১০ টর্নেডো (Tornado)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- টর্নেডোর সংজ্ঞা বলতে পারবেন এবং
- টর্নেডোর বৈশিষ্ট্য, উৎপত্তি ও গঠন ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

টর্নেডো

টর্নেডো মূলত অতি দ্রুত আবর্তনশীল ক্ষুদ্র আকারের অথচ প্রলয়ঙ্কারী বজ্রঝড়। এটি চোঙ আকৃতির হয়ে থাকে এবং এই বজ্রঝড়ের মধ্যভাগে বায়ু অতিদ্রুত বেগে উপরে উঠতে থাকে। এই চোঙ যদি ভূমি স্পর্শ করে তখন ধ্বংসলীলা ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। তবে চোঙ ভূমি স্পর্শ না করলে তেমন ক্ষয়ক্ষতি হয় না। টর্নেডোর ব্যাস ভূ-পৃষ্ঠের উপরে ১০০ থেকে ৫০০ গজ পর্যন্ত হয়। টর্নেডোর ভিতরে ও বাইরের বায়ু চাপের গড় পার্থক্য প্রায় ২ ইঞ্চি। তবে কখনো কখনো তা ৫ ইঞ্চি হয়ে যায়। টর্নেডোর চোঙ মাটি স্পর্শ করলে ব্যাপক শব্দে সবকিছু ধূলিসাৎ হয়ে যায় এবং কালো মেঘে ছেঁয়ে যায়।

টর্নেডোর বৈশিষ্ট্যঃ টর্নেডোর বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নে আলোচিত হলো-

১. টর্নেডোতে প্রথমত আকস্মিকভাবে বায়ু চাপের হ্রাস ঘটে বলেই বড় বড় ইমারতে ফাটল ধরে।
২. বায়ুর আবর্তন হয় অত্যন্ত দ্রুতবেগে। ফলে বায়ুপ্রবাহের সম্মুখে প্রতি বর্গফুটে বায়ুচাপের পরিমাণ হয় ১৬০ থেকে ১০০০ পাউন্ড।
৩. টর্নেডোর উত্তোলন ক্ষমতা অনেক ভয়ঙ্কর। ভয়ঙ্কর বেগে টর্নেডোর বায়ু উপরের দিকে উত্থিত হয় এবং পথে যা পায় তাই তুলে নেয়।
৪. ভূমিতে টর্নেডোর রৈখিক গতিবেগ বিভিন্ন টর্নেডোর ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকমের হয়। যেমন- উত্তর গোলার্ধে টর্নেডো দক্ষিণ পশ্চিম দিক থেকে আসে।
৫. টর্নেডোর গতিপথ অর্ধবৃত্তাকার হতে পারে এবং উত্তর গোলার্ধে টর্নেডো ডানদিকে আবর্তিত হয়।
৬. টর্নেডোর গতিবেগ ঘন্টায় ৫ হতে ৬৫ মাইল হয়ে থাকে। তবে কখনো কখনো গড় গতিবেগ ঘন্টায় ৩৫ থেকে ৪৫ মাইল হয়।
৭. পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি টর্নেডোপ্রবণ এলাকা উত্তর আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়া।
৮. সমুদ্রের উপর টর্নেডো সৃষ্টি হয়। যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূলের নিকটস্থ সমুদ্রে, মেক্সিকো উপসাগরে এবং চীন ও জাপানের উপকূলের নিকটস্থ সমুদ্রে গ্রীষ্মকালে টর্নেডোর প্রকোপ দেখা যায়।
৯. টর্নেডো ব্যাপক জানমাল ও পরিবেশের ক্ষতিসাধন করে।

টর্নেডোর উৎপত্তি : সাধারণত উত্তর গোলার্ধের কোনো স্থানীয় স্থল নিম্নচাপের দক্ষিণ-পূর্ব অংশেই টর্নেডোর উৎপত্তির হয়। টর্নেডো শীতল বায়ুপ্রাচীরের সাথে সমান্তরালভাবে দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়। আবার টর্নেডো সংঘটিত হওয়ার সময় ঊর্ধ্ব বায়ুস্থ পশ্চিমা জেট প্রবাহের কারণে দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	টর্নেডোর বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী তা লিখুন।

সারসংক্ষেপ

টর্নেডো অতি ক্ষুদ্র আকারের বজ্রঝড়। এটি দ্রুত আবর্তনশীল এবং আকৃতি অনেকটা চোঙের মত। টর্নেডোর বিধ্বংসী শক্তির জন্য পৃথিবীতে নানা ধরনের ক্ষতিসাধন হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.১০

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। টর্নেডোর চোঙের ব্যাস কত ?

(ক) ২০০-৩০০ গজ (খ) ১০০-৫০০ গজ (গ) ৩০০-৫০০ গজ (ঘ) ৫০০-৬০০ গজ

২। টর্নেডোর বৈশিষ্ট্য-

i. টর্নেডোর চোঙ মাটি স্পর্শ করলে ক্ষয়ক্ষতি বেশি হয়।

ii. টর্নেডোর কেন্দ্রে চোখ থাকে iii. টর্নেডো গমনপথ অর্ধবৃত্তাকার

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বেশি টর্নেডো কোথায় হয়?

(ক) ভিয়েতনাম ও শ্রীলঙ্কায় (খ) ইন্দোনেশিয়া ও প্রশান্ত সাগরের নিকটবর্তী এলাকায়

(গ) উত্তর আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ায় (ঘ) ভারত মহাসাগরের নিকট

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

পৃথিবীতে নানাভাবে প্রাকৃতিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়। পৃথিবীর বায়ুর তাপ, চাপ, আর্দ্রতা, বায়ুপ্রবাহের দিক পরিবর্তন ইত্যাদির প্রভাবে ঋতু পরিবর্তন সংঘটিত হয়। এই পরিবর্তনের কারণে পৃথিবীব্যাপী একেক অঞ্চলে একেক ধরনের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

ক. আবহাওয়া কাকে বলে?

খ. আবহাওয়া ও জলবায়ুর পার্থক্য কী?

গ. বায়ুর তাপমন্ডলের বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করুন।

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে আবহাওয়া ও জলবায়ুর নিয়ামকসমূহ বর্ণনা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.১ :	১. গ	২. খ	৩. খ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.২ :	১. ঘ	২. খ	৩. গ	৪. গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৩ :	১. খ	২. গ	৩. গ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৪ :	১. খ	২. খ	৩. ক	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৫ :	১. ঘ	২. ক		
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৬ :	১. ঘ	২. ঘ	৩. ক	৪. ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৭ :	১. ঘ	৩. গ	৪. খ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৮ :	১. খ	২. ঘ		
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৯ :	১. ক	২. খ	৩. খ	৪. ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.১০:	১. খ	২. ঘ	৩. গ	